সজনীকান্ত ও তাঁর মানস-কন্যা

অরবিন্দ পুরকাইত

মনে রাখি, ভুলে যাই, ভালবাসি, ঘৃণা করি পুনঃ
যাহারে ঠেলিয়া ফেলি তারি লাগি কাঁদিয়া ভাসাই।

শিল্পী-সাহিত্যিকের জীবনে একাধিক সত্তার উপস্থিতি দুর্লক্ষ নয়। বস্তুত, এই একাধিক সত্তার টানাপোড়েনেই বেশিরভাগ সময় রচনা করে চলে মহত্তর সৃষ্টির ভূমিকা। যে শিল্পি-সাহিত্যিক যত দক্ষতার সঙ্গে নিজের একাধিক সত্তার আন্তঃজাগরণ ঘটাতে সক্ষম হয়ে, তাকে সুচা ভাবে চারিত করতে পারেন তাঁর সৃষ্টিকর্মে অন্যের অনুভূতিদেশকে তত বেশি নাড়া দেওয়া সম্ভব হয় তাঁর পক্ষে। এখানে বলাবাহুল্য যে একাধিক সত্তার উপস্থিতি মানেই সেই ব্যক্তির প্রতিদিনের জীবনযাপনে তার প্রতিটিই যে প্রকটভাবে ভূমিকা গ্রহণ করবে তা কিন্তু নয়।

সজনীকান্ত (৯ ভাদ্র ১৩০৭----২৮ মাঘ ১৩৬৮) লোকটি ছিলেন এক কথায় জমাটি। সতীর্থদের স্মৃতিচারণায় আমরা জেনেছি, অতিশয় উপভোগ্য ছিল তাঁর সঙ্গ। ব্যক্তিত্বে এবং বাক্যে তিনি ছিলেন অত্যন্ত আকর্ষনীয়। আড্ডা 'দেওয়া' এবং 'মারা' দুটোতেই তাঁর খ্যাতি ছিল ঈর্ষণীয়। কথার তোড়ে একবার তাঁকে পেলে আর দেখে কে-----এমনকি অনেক সময় সম্ভব-অসম্ভব জ্ঞানও রহিত হয়ে যায় তাঁর এই সময়ে। তখন যেন তিনি সেই 'বিচিত্র মর্মস্পর্শী আদেশ' --এর বশবর্তী হয়ে পড়েন----- "কথা কও, কথা কও"। 'কথা কহিতে হইবে। কবে, কখন,কোথায়, কাহাকে, কেমন করিয়া? ----এ সকল অতি সমীচীন প্রশ্ন চপল অবোধ বালকের মনে ক্ষণিকের জন্য উদয় হয় না। বস্তুত, ঐটা তাঁর বালককালের কথা হলেও, বয়সকালেও এই বৈশিষ্ট্য রীতিমত বর্তমান ছিল তাঁর মধ্যে। কিন্তু এই 'প্রত্যক্ষ, সকলের গোচর' জীবনের বাইরেও তাঁর আর একটি জীবন ছিল যা শুধু অন্যের অগোচর নয়, তাঁর নিজেরও সম্পূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে নয়----'কতকটা অবাঙ্‌মানসগোচর, সৃষ্টিরহস্যসমুদ্রের উপরিভাগ যাহা মাঝে মাঝে কমলের মত শোভমান হইয়া সুরভি বিস্তার করিয়া অতলে তলাইয়া যায়---যাহার বিকাশ শুধু অনুভব করা যায়, বাস্তবে ধরা ছোঁয়া যায় না।' একজন সত্যিকারের সাহিত্য-প্রেমিক মানুষ হিসাবে সজনীকান্তের এ বিশ্বাস ছিল অতি গূঢ়, গোপন, রহস্যময় এই জীবনকে বাঙময় প্রকাশ দিতে পারেন শুধু কবিরা। আর 'কাব্যসরস্বতী জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে' তাঁরও কাঁধে ভর করেছেন। তাই প্রকৃত সজনীকান্তকে আমরা বেশি করে পাই তাঁর কবিতায়। তাঁর গভীর কবিতাগুলি নতুন কাব্য ভাষা না দিলেও, সজনীকান্তকে দিয়েছে অনেক বেশি করে।

সেই সজনী দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-দোলাচল-দীর্ণ এক মানুষ। আর তাই তাঁকে শিরোনাম রচনা করতে হয় 'দুই-মে', 'বজ্র-আশীর্বাদ' বা 'দুই নৌকা', 'আলো-আঁধারি ' ইত্যাদি নামে---কব্যে বা আত্মজীবনীতে । সেই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব অনেক সময় সাহিত্য না বিজ্ঞান, সহিংস বিপ্লব না অহিংস, সাহিত্য-সাধনার অনিশ্চয় জীবন নাকি চাকুরি ইত্যাদির সুনিশ্চয় জড়পড়তা জীবন----এমন সব বিষয়েও সম্পৃক্ত ছিল। কখনও কোনও সাহিত্যিককে (তারাশঙ্করকে ২৪ জুন, ১৯৪২) 'ভাই' সম্বোধন করে লিখছেন, 'তোমার পত্র পেয়ে এবং নীলুর মুখে তোমার অসুখের অবস্থা শুনে চিন্তিত হয়েছি। যদি ওখানে একটুও না কমে অবিলম্বে এখানে চলে এস, এখানে ভাল ডাক্তারের ব্যবস্থা করতে হবে। একটুও অন্যথা করো না।' আবার কখনও সাহিত্য-সমালোচনার নামে সাহিত্যের সীমা ছাড়িয়ে ব্যক্তিগত স্তরে কুৎসিত আক্রমণ করছেন। কোনও সাহিত্যিককে মাথায় তুলছেন আবার কাউকে জোর করে করছেন নস্যাৎ----আখ্যাত করছেন 'পাগল' বলে (যে পত্রিকায় লেখা প্রকাশিত হয়েছে তার সম্পাদককেও রেহাই দিচ্ছেন না)। বস্তুত, তাঁর দ্বিধা-দ্বন্দ্ব দোলাচলের প্রকাশ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে সেকালের সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র তাঁকে আখ্যাত করেছেন পাগল বলে আর একালের সমালোচিকা সুমিতা চক্রবর্তী সন্দেহ প্রকাশ করেছেন অব্যবস্থিতচিত্ততার। আশ্চর্য এই যে, নিজের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে সজনীকান্তও মাঝেমধ্যে 'অব্যবস্থিত জীবন' বা 'অব্যবস্থিতচিত্ত' শব্দগুলো প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু সে তাঁর জীবনের কোনও কোনও পর্যায়কে মাত্র----যা কিনা যে কোনও ব্যক্তির ক্ষেত্রেই সম্ভব। আবার উল্টোদিকে আমরা ভুলতে পারি না অচিন্ত্যকুমারের সেই অবিস্মরণীয় উক্তি শক্তিধর সজনীকান্ত! লেখনীতে তো বটেই, ব্যক্তিত্বেও। তাঁকে 'একজন চৌকস লেখক' হিসাবে উল্লেখ করে হেমেন্দ্রকুমার রায় বলেছেন, 'নিজের বাড়ীতে এবং অন্যান্য আসরেও সজনীকান্তের সান্নিধ্য লাভ ক'রে উপলব্ধি করতে পেরেছি, তাঁর সঙ্গ হচ্ছে অতিশয় উপভোগ্য।' তাঁকে একজন সত্যকারের সাহিত্যরসিক ও মানুষ হিসাবে একজন উদার মানুষ' হিসাবে উল্লেখ করে তারাশঙ্কর বলছেন, 'কিন্তু গুণ, আমি দেখেছি। যাচাই করেছি। সে অনেক এবং তা সুদুর্লভ। এত গুণের মানুষ বর্তমানকালে বেশি নেই।'তাহলে একইসঙ্গে 'পাগল' 'অব্যবস্থিতচিত্ত', আবার এই বিপরীত চিত্রসমূহ! ঠিক মেলানো যাচ্ছে না যে!

তবে কি এর মধ্যে কিছু খেলা ছিল! যেমনটি বলেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, 'খেলাচ্ছলেই আমরা দাঁড়িয়েছিলুম পরস্পরের বিদ্ধে, আমাদের মধ্যে ছিল না কিছুমাত্র রেষারেষির ভাব।.....আমাদের বিরোধটা ছিল অভিনয় মাত্র।' আগে 'বিদ্ধ সমালোচনায় আহত' করেও পরে বন্ধুপে সৌহার্দ্যের সম্পর্ক স্থাপন করেছিলেন হেমেন্দ্রকুমারের সঙ্গে। এক গানের আসরে নজলকে অক্লান্তভাবে গান গেয়ে যেতে দেখে মনে হয়েছিল, 'বর্তমানের মানুষটিকে ভালবাসা যায়, সমালোচনা করা যায় না।' কিন্তু তার পরেও কি নজল তাঁর আক্রমনের হাত থেকে রেহাই পেয়েছেন! শরৎচন্দ্রের কী গুণমুগ্ধই না তিনি ছিলেন! সেই শরৎচন্দ্রের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর আত্মজীবনী থেকে দেখা যায় সজনীকান্ত সেটা ব্যক্তিগত স্তরে নেননি। দৃষ্টান্ত বাড়িয়ে লাভ নেই, সর্বোপরি রবীন্দ্রনাথে আসি। ব্যক্তিত্ব হিসাবে এবং সাহিত্যিক হিসাবে, সজনীকান্তের কাছে প্রায় দেবতার আসনে আসীন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁকেও করলেন বারবার আক্রমন। বারবার ব্যথিত হয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। এমনকি ডাকে পাঠানো সজনীর পত্রিকাও গ্রহন না করে ফেরত পাঠিয়েছেন তিনি। আশ্চর্য এই যে, সজনীকান্ত রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যতত্ত্ব তথা সাহিত্য-সমালোচনাতত্ত্ব ভাল করেই জানতেন। এক সভায় (জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা ভবনে), সমগ্র দৃষ্টিতে না দেখে খন্ড দৃষ্টিতে সাহিত্য সমালোচনা করার বিদ্ধে এবং কেবল মাত্র ছিদ্রান্বেষণের মধ্যে সমালোচনাকে সীমাবদ্ধ না রাখার প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যের প্রেক্ষিতে সজনীকান্ত তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন যে তঁ

ার বক্তব্য 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্ধে কিনা। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে হ্যাঁ, তা শনিবারের চিঠির বিদ্ধেই। কিন্তু তার পরেও সে পত্রিকার সমালোচনার ভঙ্গী বদলায়নি। বদলাবেই বা কেন? 'সবুজ কালিতে ছাপা চাবুকপ্রহাররত এক ভীম অথচ সুঠাম বীরমূর্তি' প্রচ্ছদ-নিন্দিত পত্রিকার মুখবন্ধেই (১০ শ্রাবন ১৩৩১) তো তার ভগীরথ অশোক চট্টোপাধ্যায় (সম্পাদক ও মুদ্রাকর যোগানন্দ দাস--সজনীকান্ত তখনও 'চিঠি'তে অবতীর্ণ হননি) বলে দিয়েছেন, '.....আমরা যতক্ষন আছি ততক্ষণ আমাদের স্বভাবই আমাদের কখনো উদ্দেশ্যযুক্ত ও কখনো উদ্দেশ্যহীন করে চালাবে।......অনেক রকম গোলমালই আমরা বাধাব,.....।' এমনও হয়েছে যে সজনীকান্ত ব্যাকুলভাবে চাইছেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পুনর্মিলন হোক এবং রবীন্দ্রনাথও গলতে শু করেছেন (এ ব্যাপারে হেমন্তবালা দেবীর ভূমিকা গুত্বপূর্ণ) এমন সময়েও কথার তোড়ে ভেসে যেতে যেতে রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিপ উক্তি করে বসেছেন। এই দীর্ঘতরকে খর্ব করা----ইহাই বাংলা-সাহিত্যে আমার সর্বপ্রথম কীর্তি, আধুনিক ভাষায় ''অবদান'' ও বলিতে পারি।----এই উক্তি যিনি করতে পারেন তাঁর পক্ষে এটা অসম্ভব বা বেমানান নয়। আবার ক্ষমা ভিক্ষা করে নেওয়াও তাঁর চরিত্রের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। সে ক্ষমা ভিক্ষার ভাষাও প্রায়ই এইরকম---যেমনটি করেছিলেন 'বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস' গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে শ্রদ্ধেয় স্বর্গীয় দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়কে--যৌবনের উদ্ধত চাপল্যে একদিন 'শনিবারের চিঠি'তে ''দীনেশ-নামা'' লিখিয়াছিলাম, উদারহৃদয় দীনেশচন্দ্র শেষ বয়সে আমাকে ক্ষমা তো করিয়া ছিলেনই, আন্তরিক আশীর্বাদও করিয়াছিলেন! দুঃখের বিষয়, তাঁহার জীবিতকালে আমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতে পারি নাই, আজ করিলাম।

আর যাই হোক সজনীকান্ত যে সাহিত্য-প্রেমিক ছিলেন এবং সাহিত্যকে অবলম্বন করেই বাঁচতে চেয়েছিলেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। আসলে সজনীকান্ত বিখ্যাত হতে চেয়েছিলেন এবং তা মুলত সাহিত্য-মাধ্যমেই। আর তার জন্যে তিনি বিখ্যাতদের বেছে নিয়েছিলেন---তাঁদের মূলত ত্রুটি-বিচ্যুতি খুঁজে বের করে প্রকাশ করতে এবং নিজেও প্রকাশিত হতে। ব্যঙ্গ-কবিতাকে (এ বিষয়ে বিখ্যাত তাঁর 'কামস্কাট্‌কীয় ছন্দ') বেছে নিয়েছিলেন দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভের উদ্দেশ্যে। অনেকসময় নিজের রচনা অন্যদের শোনানো এবং তা প্রকাশে তাঁর নির্লজ্জ নাছোড় আচোরণ তাঁর সেই বিখ্যাত হতে চাওয়ার মানসিকতারই ফল। বিখ্যাত ব্যক্তিদের ব্যবহৃত জিনিসপত্র সংগ্রহের বাতিকও তাঁর সেই মানসিকতার প্রকাশ। এ ব্যাপারে দু-একবার তিনি বেশ লজ্জায়ও পড়েছিলেন।

পরিমল গোস্মামী বলেছেন, 'সজনীকান্তের একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল অন্যের ক্ষমতা উপলব্ধি করার। একে 'ইনট্যুইশন' বলা চলে। তারাশঙ্কর বলেছেন যে, সাহিত্য-বিচারক, সাহিত্য- প্রেমিক হিসাবে সজনীকান্তের দোসর কেউ. ছিলেন কিনা সন্দেহ। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'সাহিত্যের সমঝদার' বলে চিনতে পেরেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখেছি গদ্যের ক্ষেত্রে সজনীকান্ত সাহিত্য-বিচারে যতটা সফল, কবিতার ক্ষেত্রে তত নন। 'পথের পাঁচালীর প্রকাশক জুটছেনা দেখে রাতারাতি তিনি প্রকাশক বনে গিয়েছিলেন। এমনকি বন্ধু রবীন্দ্রনাথ মৈত্রের নির্বাচিত গল্পটি সরিয়ে রেখে তারাশঙ্করের 'শ্মশানঘাট' ছেপেছেন 'বঙ্গশ্রীতে' । প্রকাশকের অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে, তারাশঙ্করের পুস্তক প্রকাশের ভার নিয়েছিলেন তিনি। মানিক বা মনোজকে চিনে নেতে ভুল হয়নি তাঁর। অথচ কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর মূল্যায়ন পরবর্তীতে ধোপে টেকেনি (যদিও মূলত তিনি একজন কবিই)। রবীন্দ্রোত্তর কবিদের মধ্যে বিশিষ্টতা দেখিয়েছিলেন যে জীবনানন্দ, অমিয় বা সুধীন্দ্রনাথ, 'নিত্ত' পত্রের একটি সংখ্যায় প্রকাশিত (আরও একজন ছিলেন---হরপ্রসাদ মিত্র) তাঁদের কবিতার বিচার করতে গিয়ে তাঁদেরকে 'একই হাসপাতালের পাশাপাশি বিছানা' আশ্রিত বলে উল্লেখ করেছেন। রেহাই দেননি বুদ্ধদেব বসুকেও (ইনি সারাজীবন অভিমান পুষে রেখেছিলেন সজনীকান্তের উপরে)। আধুনিক কবিতার তুলোধোনা করতে গিয়ে একবার সম্পাদক প্রেমেন্দ্র মিত্র ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য সম্বন্ধে বলেছেন, 'কিন্তু যাহারা ঘটা করিয়া এই সকল বীভৎসতাকে বাহিরের আলো-বাতাসের রাজ্যে জনতার মাঝখানে প্রকাশ করিয়া আনন্দ পায়, তাহারা কি---পাগল বা বদমাস্, অথবা দুইই?'

কবিতা সমালোচনার নামে জীবনানন্দের ক্ষেত্রে তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখেছেন তা বোধহয় পৃথিবীর ইতিহাসেই দুর্লভ। সমালোচনা যে কত ছেলেমানুষি হতে পারে, কত অহেতুক, উদ্ভট, অসংলগ্ন, উদ্দেশ্য-প্রণোদিত, ব্যক্তিগত আক্রমণাত্মক এবং যাচ্ছেতাই হতে পারে তা তিনি দেখিয়েছেন জীবনানন্দের ক্ষেত্রে। আসলে সজনীকান্ত ছিলেন গতানুগতিক কাব্যভাষার প্রবল সমর্থক। তাঁর বক্তব্যও এমন ছিল যে রবীন্দ্র-সমসাময়িক বা রবীন্দ্রোত্তর কবিরা আসলে রবীন্দ্রনাথের দোয়ার্কিই করে গেছেন এবং যে দু-একজন অন্যরকম কিছু করতে চেয়েছেন তাঁরা কল্কে পাননি। আধুনিক কাব্য-ভাষা খোঁজার প্রয়াসকে যে তিনি বরাবর বত্র দৃষ্টিতে দেখে গেছেন তা বেশ বোঝা যায় জীবনানন্দের 'ধূসর পান্ডুলিপি' প্রকাশ পাওয়ার পরেই তাঁর প্রতি কটূক্তি বর্ষণ শু হওয়ায়। আগের, বেশিরভাগটাই গতানুগতিক ধারায় রচিত 'ঝরা পালক' কাব্য গ্রন্থ প্রকাশের পর সজনীকান্তর কটূক্তি শোনা যায়নি। প্রশংসাও নয় অবশ্য। কিন্তু একজন কবি হিসাবে, জীবনানন্দের কোনও কবিতা বা কোনও কবিতার কোনও পঙ্‌ক্তি কি সজনীকান্তর ভালো লাগেনি কোনওদিন! তেমন বিশ্বাস করতে আমাদের বাধে। তবে এখানেও কি ছিল সেই খেলা! নইলে স্বয়ং জীবনানন্দও কি ততটা চিন্তিত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু (বনলতা সেন-পরবর্তী), যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তর মত কবিদের মূল্যায়ন নিয়ে বা সেইসব সহকর্মী প্রমুখকে নিয়ে যারা সামনে উপহাস করেছে আবার পিছনে পত্রিকার জন্যে সরবরাহ করেছে রংদার মশলা? যেমন কৌতুকচ্ছলে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা এক পত্রে জীবনানন্দ লিখেছেন, 'যা দু-একটা ছাপার ভুল চোখে পড়ল ঠিক করে দিলাম। কবিতা ও ন্দন্ত্রুস্ত্র ছন্দন্ত্রুস্ত্র নয়) উদ্ভ্রব্দ সম্পর্কে যেন ন্দ্বজত্ত্বদ্বন্দ্ব না বেরোয়।' বা বাণী রায়কে বলেছেন, 'সজনীবাবুকে বলবেন এমনিভাবেই যেন আমার আরো প্রচার করেন।' একবারই মাত্র তাঁর ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। 'ক্যাম্পে' কবিতা সম্বন্ধে অশ্লীলতার প্রসঙ্গে। প্রতিবাদও লিখলেন একটা (যেখানে বলেছেন, 'কিন্তু তবুও 'ক্যাম্পে' অশ্লীল নয়। যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থাকে তা জীবনের---মানুষের- কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়----'ক্যাম্পে' কবিতাটির ইঙ্গিত এই; এই মাত্র।.....') কিন্তু স্বভাবগত উদাসীনতাবশত তা কোথাও

প্রকাশ করলেন না। এমনকি ভূমেন্দ্র যখন চেয়ে নিলেন তখন তাঁকে সেটা দিলেন, না ছাপার কড়ারে। জীবনানন্দর শেষবেলা সজনীকান্ত তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে যৌবনে তাঁর প্রতি অবিচার করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু আশ্চর্য লাগে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু পর্যন্ত (১৯৪১) এসে থেমে যাওয়া তাঁর 'আত্মস্মৃতি' যখন লেখা চলছে জীবনানন্দের মৃত্যুর (১৯৫৪) পরেও---সেই আত্মজীবনিতে জীবনানন্দের উল্লেখ একবারও নেই। বোধহয় জীবনানন্দের বিষয়ে তিনি লজ্জিত ছিলেন। আক্ষেপ হয়, জীবনানন্দের সঙ্গে সজনীকান্তের কেন যে একটু ব্যক্তিগত পরিচয় হল না। তাহলে হয়তো জীবনানন্দের প্রতি একটু কণা হত তাঁর। 'তিনি গন্ডারের মতোই রসিক, হাসি-ঠাট্টা বরদাস্ত করিতে পারেন না, ঘরে খিল লাগাইয়া থাকেন।'---এমন অনায়াস উচ্চারণ তখন হয়ত সম্ভব হত না।

আসলে সজনীকান্ত তাঁর মানস-কন্যা 'শনিবারের চিঠিকে' দীর্ঘায়ু দেখতে চেয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে নিজেও হতে চেয়েছিলেন দীর্ঘায়ু। অজস্র সাময়িক পত্রিকার জন্ম এবং অল্পকালের মধ্যে তাদের মৃত্যু সম্বন্ধে সজনীকান্ত বরাবরই ছিলেন অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। জগদীশ ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'বৈজয়ন্তী' এবং ফণীন্দ্রনাথ ঘোষ সম্পাদিত 'প ও রীতি' পত্রিকা দুটি সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে সজনীকান্ত একবার বলেছিলেন, ''প ও রীতি''র আভিজাত্য-মার্কায় তবুও সন্দেহ হয়, 'বৈজয়ন্তী'র সাহিত্য-নিষ্ঠা নিঃসংশয়ে অকৃত্রিম। এই কারণেই পত্রিকা দুইটি চলিবে বলিয়া ভরসা করিতেছি না।', অর্থাৎ পত্রিকা কিভাবে চলবে তা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা-ভাবনা করেই, দৃঢ়ভাবে চলেছিলেন নির্দিষ্ট পথ বেছে নিয়ে। মূলতঃ সে পথ ছিল গভীর থেকে খেলো লেখার সহাবস্থানের পথ এবং চাবুক চালিয়ে (অনেক সময়ে তা শূন্যেই) সকলের সচকিত দৃষ্টি সেদিকে আকর্ষিত করার। আর সেটা করতে গিয়ে 'অতিশয় অপ্রিয় ও দুঃখকর আলোচনার ভার' নিয়েছিলেন তিনি নিজে।মোহিতলাল বলেছেন, 'নিন্দার বিষ নিজ অংশে রাখিয়া যেভাবে প্রশংসার মধু আমার জন্য সংগ্রহ করিতেন এবং তাহাতেই কৃতকৃতার্থ বোধ করিতেন--আজিকার দিনে সেরূপ সাহিত্য-প্রীতি যথার্থই দুর্লভ।' বেনামী অনেক প্রবন্ধের লেখক বলেও তিনি গণ্য হয়েছেন তবু বেনামীর নাম প্রকাশ করে দেননি বা তাঁর কাগজে প্রকাশিত প্রবন্ধের

উপরে বা নিচে লিখে দেননি, মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নয়---এমত লিখে গেছেন তারাশঙ্কর। নীরদচন্দ্র চৌধুরীও যে ব্যঙ্গকৌতুককে তাঁদের প্রধান অস্ত্র হিসাবে চেয়েছিলেন এবং তার জন্যে, বয়সে ছোট হলেও, তাঁরা প্রধানত সজনীকান্তর উপরেই নির্ভর করেছিলেন।

'শনিবারের চিঠি'র অন্যতম অভিযান ছিল আধুনিকতার নামে সাহিত্যে অশ্লীলতার বিদ্ধে। অথচ তাঁর আত্মজীবনীতে সজনীকান্ত বলেছেন যে তাঁদের প্রতিবাদ সাহিত্যে অশ্লীলতার বিদ্ধে নয়----'ভানের বিদ্ধে, ন্যাকামির বিদ্ধে, দুর্বল ও অক্ষমের লালায়িত সৃক্কনীলেহনের বিদ্ধে।' সত্যসুন্দর দাস নামে মোহিতলালের যে লেখাটি---তিনি এর সপক্ষে উদ্ধৃত করেছিলেন তাতে পরিষ্কার সিদ্ধান্ত আছে, 'সাহিত্য অশ্লীল হইতে পারে না।' কিন্তু আমরা জানি এই সজনীকান্ত স্বয়ংই অশ্লীলতার অভিযোগ এনেছিলেন জীবনানন্দের 'ক্যাম্পের' বিদ্ধে। শুধু তাই নয়, লজ্জাজনকভাবে 'ড্যাস' (--) চিহ্নের অন্তরালে আবিষ্কার করলেন অশ্লীলতার উপাদান। অশ্লীলতার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে গিয়ে বিভিন্ন লেখা থেকে পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তি পুণর্মুদ্রিত করেছেন 'শনিবারের চিঠি'তে। বলা বাহুল্য, প্রেক্ষিতহীনভাবে তুলেধরা সেই সব দৃষ্টান্ত অনেকসময়ই তুলনামুলকভাবে বেশি মশলাদার হয়ে উঠেছে। আসলে এখানেও সেই খেলা। পত্রিকার আকর্ষণ ধরে রাখা। সেই ব্যবসা-বুদ্ধি--পত্রিকার প্রচার বাড়াবার কৌশল। যার কথা বলেছেন হেমেন্দ্রকুমার রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত থেকে সুশীলকুমার দে বা সুকুমার সেন পর্যন্ত। এমনকি 'কল্লোল' এর দলকে আক্রমণকে ভানও বলেছেন হেমেন্দ্রকুমার। বলেছেন ''শনিবারের চিঠি''র চাহিদা বাড়াবার জন্যেই সজনীকান্ত তুলেছিলেন অশ্লীলতার অজুহাত। ব্যবসাদারি চাল ছাড়া আর কিছু নয়। কারণ যে শ্রেণীর রচনার জন্যে তিনি ''কল্লোল''কে আক্রমণ করতেন, ঠিক সেই শ্রেণীর গল্পই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ''শনিবারের চিঠি''তে। হেমেন্দ্র 'চিঠি'তে প্রকাশিত গল্পের কথা বলেছেন। কিন্তু স্বয়ং সজনীকান্তই তাঁর একাধিক কবিতায় এ দৃষ্টান্ত রেখেছেন। যেমন বকুলবন, সূর্যমুখী, পান্থ-পাদপ প্রভৃতি কবিতা। এসব কথা তিনি তাঁর আত্মস্মৃতিতে স্বীকারও করেছেন। পাশ্চাত্য কবিরা যে সাহিত্য ও যৌনজীবনকে আলাদা করেন না---সবই উদ্‌ঘাটন করে দেখান তিনি তাঁর 'অজয়' উপন্যাসে সেই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন বলে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। তাঁর ধারাবাহিক 'নকুড় ঠাকুরের আশ্রম'-এশ্লীলতা-ভঙ্গের অপরাধে ধৃত হয়েছিলেন। আবার এই সজনীকান্তকেই দেখি একসময় অশ্লীলতার নামে শিল্প-সাহিত্যের উপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপের বিদ্ধে--- তারাশঙ্করের নেতৃত্বে--- অভিযানে যেতে মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে।

ব্যবসা-বুদ্ধি যে তাঁর প্রবল ছিল তার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যায় 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' সম্পর্কে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বলিত (অভিযোগ গুতর কিছুই না) একটি ছোট-চিঠি (শনিবারের চিঠি-র এক পৃষ্ঠার বেশি না) না ছাপানোর কড়ারে কম্পোজিং-এর ক্ষতিপূরণ বাবদ অবলা বসুর কাছ থেকে কুড়ি টাকা আদায় করা থেকে। যেখানে 'চিঠি'র মোট ষোল পৃষ্ঠা কম্পোজিং ছাপা ও কাগজের দাম সহ এক হাজারের জন্য মোট খরচ পড়ত সাত টাকা বারো আনা (এর উপর ছিল কভার ও বাঁধাই খরচ)। অর্থাৎ বেশ বোঝা যায় তিনি যে বলেছিলেন,

বাণী পূজার ছলে
পৃথিবীজুড়ে গাঁয়ের হাটে হাটে
বেচাকেনার বসেছে জোর মেলা
সাজিয়ে তুলে নকল সরস্বতী
কমলা-কৃপা মাগিতে সবে ফিকির খোঁজে নানা।

এ কথা তাঁর সম্বন্ধেও সমান সত্য। সজনীকান্ত বলেছিলেন যে, তাঁর ব্যঙ্গ কখনই ঈর্ষা (malice) প্রণোদিত ছিল না অথচ নীরদচন্দ্র চৌধুরী বলেতে চেয়েছেন তা মূলতঃ malicious- ই। আসলে সজনীকান্তের সমালোচনায় কী যে ছিল না সেটাই আশ্চর্য! যাই হোক, শনিবারের চিঠির কটুক্তি যাঁর ভাগ্যে জোটেনি তিনি অবশ্য হতভাগাই ঠাউরেছেন নিজেকে। প্রতিষ্ঠানের তেমন টলেনি কিন্তু তণরা তৃষ্ণার্ত হয়ে উঠেছিলেন সমালোচিত হওয়ার অবসরে একটু প্রচারিত হওয়ার।

শেষ পর্যন্ত সজনীকান্ত তাঁর উদ্দেশ্যে সফল। সচেতনভাবে যা করতে চেয়েছিলেন তা তিনি করতে পেরেছেন। তিনি গভীর কবিতা লিখেছেন। ব্যঙ্গ-কবিতায় দেখিয়েছেন অসাধারণ নৈপুণ্য। 'বহুপী বিদূষক' 'বহুসন্ধানী গবেষক' হয়ে ব্যবসা-বুদ্ধির বিপরীতে রচনা করেছেন ' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস'। মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ জীবন ও সাহিত্য' শিরোনাম প্রকাশ করেছেন মূল্যবান সংকলন। গল্প লিখেছেন শতাধিক গান লিখেছেন।তাঁর গানকে এমনকি রবীন্দ্রনাথের গান বলে ভুল করেছেন অনেকে। সফল হয়েছেন চিত্রনাট্য রচনাতেও। উপন্যাসও রচনা করেছেন। তবু সজনীকান্ত বেশি করে বেঁচে থাকবেন তাঁর মানস-কন্যা শনিবারের চিঠি-র সঙ্গে আত্মিক সম্পর্কের অনুষঙ্গেই। বস্তুতঃ জীবনে বঙ্গশ্রী, চিত্রলেখা, বিজলী, যুগবাণী, অলকা, সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ইত্যাদি নানা পত্রিকার সম্পাদনায় নিযুক্ত হলেও এই মানস-কন্যাটির পিছনেই সবচেয়ে বেশি মেধা মনন অধ্যবসায় আয়ু নিয়োগ করেছেন তিনি আমৃত্যু। তাই আজ সজনীকান্ত বললেই শনিবারের চিঠি আর শনিবারের চিঠি বললেই সজনীকান্তর কথা মনে পড়ে যায়। যে শনিবারের চিঠির প্রয়োজন আছে সাহিত্যের সর্বযুগে ----হয়ত আর একটু সংস্কৃত ও সংযত পে এই যা।

সমালোচক সজনী আর বন্ধু সজনী যেন দুই আলাদা মানুষ। তাঁর বন্ধুত্বে ভেজাল ছিল না। -----বলেছিলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। এমন অজস্র স্মৃতিচারন যখন পড়ি তখন দোষে- গুণে মেশানো অপ্রতিরোধ্য এক পরিপূর্ণ মানুষের মূর্তি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কারও রচনা নস্যাৎ করে দিচ্ছেন (অনেক সময় নিজের সেকেলে সাহিত্যচির কারণে) তো কারও রচনা পড়ে বা শুনে সজল হয়ে উঠেছে তাঁর চোখ। কিন্তু আজ আমাদের অজানা নয় যে তাঁর ভেঙে-চুরে ফেলাটা কিছু কিছু ক্ষেত্রে কৃত্রিম ক্রোধের প্রকাশ বই আর কিছু নয় কিন্তু তাঁর আনন্দাশ্রু তাঁর হৃদয়ের স্বতোৎসারিত আকুতিরই পরিশুদ্ধ প্রকাশ। ব্যক্তি সজনীকান্তর প্রতি অনেকসময়ই আমাদের তাই শ্রদ্ধা না করে উপায় থাকে না। বাক্যে রসিক, ভোজনে রসিক, উল্লাসের প্রকাশে রসিক এই মানুষটির নিজের সম্বন্ধে মূল্যায়ণে কিন্তু কোনও মোহ ছিল না। 'সহৃদয়-হৃদয়- বেদ্য কাব্যই যথার্থ মানুষের আত্মকথা' বলে যিনি বিশ্বাস করেছেন, 'জানা-অজানার মধ্যে দ্বিধাবিভক্ত জীবন সম্বন্ধে সেই সজনীকান্ত তাই রেখে গেছেন এই অকপট স্বীকারোক্তি------

উত্তর উত্তরে মোর, দক্ষিণ দক্ষিণে,
দোঁহে দোঁহাকার নাহি জানেপরিচয় -----
দুই শুধু এক হল আমার অন্তরে;
পরিচয়হীন ক্রোধে -----
নিস্ফল আক্রোশে দুয়ে এ উহারে হানে।
এই হানাহানি ----
আমার অন্তর ব্যাপি নিরন্তর এ দ্বন্দ্ব- মন্থন,
বিষবাষ্পে উঠে আবর্ত্তিয়া,
কুৎসিতে সুন্দর করে, সুন্দরে ভীষণ।
উত্তরে দক্ষিণে মিলি মোর আমি রয়েছে বাঁচিয়া।

सृष्टिसन्धान

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com